গল্প

আবদুল হাই শিকদার

টুকরো টুকরো ক্রিকেট

ক.

রিয়াদ সাহেব অফিসে বসেছিলেন মুখ ভার করে। এই সময় ফোন বাজলো। তিনি রিসিভার তুলে তার স্ত্রী মীরার গলা শুনতে পেলেন।

“ওগো শুনছো ৩১৪। যা মজা লাগছে।”

রিয়াদ সাহেব নড়েচড়ে বসলেন, “কিন্তু তুমি যে সকালে চিরকুটে লিখে জানিয়েছো ৩৫০০ টাকার কথা।”

“৩৫০০ টাকা! “আরে দূর দূর। ছেলেমেয়েরা এখনও ড্রইংরুমে ৩১৪ রান, ৩১৪ রান বলে হৈ হল্লা করছে।”

রিয়াদ সাহেব কিছুটা হতচকিত হয়ে বললেন, “তুমি কি আজকের ক্রিকেট খেলার কথা বলছো?”

ওপার থেকে বিরক্ত কণ্ঠে মীরা বললেন, “তুমি আমার সাথে কথা বলার সময় অমন হাবা সাজার চেষ্টা কর কেন সব সময়, বলবে?”

ঠাস করে টেলিফোন রাখার শব্দ শুনলেন তিনি। রিয়াদ সাহেব চেয়ারে বসে পা দোলাতে লাগলেন।

খ.

ফোন বাজলো, “আব্বু আমি লিসা।”

“হ্যাঁ হ্যাঁ বল, তোরা কেমন আছিস।”

“আব্বু খবর শুনেছো।”

“কোন খবর?”

“তুমি না আব্বু একদম বুড়ো হয়ে গেছো।”

“ঠিক আছে তুই বল।”

“তোমার অফিস থেকে পঞ্চাশ গজের মধ্যে খেলা হচ্ছে আর তুমি বলছো কোন খবর।”

"ও আচ্ছা, বল।"

"৩১৪, এবং আমরা যা খুশি-শোন আব্বু, আমরা এক্ষুণি ঢাকায় রওয়ানা হচ্ছি। বাসায় একসাথে ইফতার করবো।"

"আমরা মানে হামিদও কি আসছে?"

"আসছে মানে, ওতো আমার সামনে দাঁড়িয়ে।"

"বলিস কি!"

"ঢাকার মাঠে ৩১৪ রান, বল আব্বু ভাবা যায়! ইস কেন যে এ সময় চৌদ্দগ্রাম এলাম। শোন আব্বু, তুমি কিন্তু আজ অন্য কোন কাজ রেখো না। ইফতারের পর অনেক রাত পর্যন্ত বসে বসে সবাই গল্প করবো।"

গ.

জেনারেল ম্যানেজার শাহাদত আখন্দ টেবিলে কয়েকটা ফাইল রেখে মিটিমিটি হাসতে লাগলো।

রিয়াদ সাহেব বললেন, "কি ব্যাপার হাসছেন যে।"

"স্যার আপনি ছাড়া পুরো অফিসের সবাই কানে রেডিও লাগিয়ে বসে আছে।"

"রেডিও কানে লাগিয়ে বসে আছে কেন?

"দুর্দান্ত খেলা স্যার। ঢাকার মাঠে এ রকম আর কখনও হয়নি। পাকিস্তান ৩১৪ রান করেছে।"

রিয়াদ সাহেব বললেন, "তা আপনি কি খেলা শুনছেন, না-কি?"

"মাঝে মাঝে চার আর ছক্কার মারগুলো শুনে নেই আর কি।"

ঘ.

ফোন বাজলো আবার, রিয়াদ সাহেবের মা ফোন করেছেন।

"কি ব্যাপার মা, তুমি হঠাৎ।"

"তুই তো সারাদিন আছিস অফিস অফিস আর অফিস নিয়ে। ছেলেমেয়েদের খোঁজ-খবর রাখার তো সময়ই পাস না।"

"কেন, কি হলো।"

"কি হলো মানে! বুলা বড় হয়েছে। ওর ঘরে এক ছোকরার ছবি টানিয়েছে।"

"কার ছবি টানিয়েছে?"

"তুই তো চিরকালের গাধা। ছবি কার টানিয়েছে তাও জানিস না।"

"ঠিক আছে তুমিই বল না।

বলবো আবার কি? ওই ছোকরা নাকি খালি চার আর ছক্কা মারে। আফরিদি না কাফরিদি কি যেন নাম।

হ্যাঁ হ্যাঁ, পাকিস্তান দলের ক্রিকেট খেলোয়ার।

হ্যারে, ওই ছোকরা না কি এখন ঢাকায়, তা একটু খবর টবর নে না।

রিয়াদ সাহেব হাসলেন, কি যে বল মা।

পারিস তো শুধু সবকিছু হেসে উড়িয়ে দিতে। কিন্তু মেয়ে যে ওই ছোকরাকে মন দিয়ে বসে আছে।

রিয়াদ সাহেব বললেন, ঠিক আছে আমি দেখছি।

টেলিফোন রেখে পায়চারী করা শুরু করলেন।

ঙ.

আবার ফোন বাজলো। লুৎফুল ফোন করেছে।

হ্যাঁরে, ইফতারের পর কি করবি।

কি করবো জানি না। মনে হয় বাসায় থাকবো।

ঢাকা ক্লাবে চলে আয়। বিজলানী আসবে।

কোন বিজলানী!

আরে আজহার উদ্দিনের দুই নম্বর বউ।

আজহার উদ্দিন- ও আচ্ছা আচ্ছা, দেখি।

ভয়াবহ খেলা হচ্ছে। সাঈদ আনোয়ার- এজাজ সেঞ্চুরি করেছে। এখন মনে হচ্ছে টেন্ডুলকার আর কলিকাতার ছোকরাটাও কিছু একটা করবে।

চ.

রিয়াদ সাহেবের কপালের চামড়া কুঁচকে গেল। গোটা দেশই কি আজ ক্রিকেট খেলা নিয়ে পড়ে আছে না-কি। তিনি এগারো তলার উপর থেকে ঢাকার দিকে তাকালেন।

ছ.

ইফতার টেবিলে টান টান উত্তেজনা। মা, মনি, যাদু, যাদুর কয়েকজন বন্ধু, রিয়াদ সাহেব ও রিয়াদ সাহেবের স্ত্রী মীরা। বুলাকে কিছুতেই তার ঘর থেকে বের করা গেলো না। অপূর্ব, অভূতপূর্ব, অবিস্মরণীয়, ঐতিহাসিক, বিশ্ব রেকর্ড, সাঈদ, সাকলায়েন, রবিন সিং, আজহার, ডালমিয়া, গ্যারি সোবার্স, গ্রেক চ্যাপেল, রবি শাস্ত্রী, আসিফ ইকবাল, গার্ডন গ্রীনিজ-কারুরই তর্ক থেকে বাদ পড়ার কোন কারণ নেই।

যাদু ড্রইংরুম থেকে টেলিভিশন সেট ট্রলিতে ঠেলে ডাইনিং স্পেসে নিয়ে এলো।

মাগরিবের আজানের দু'মিনিট আগে লিসা এসে হাজির। সারা গায়ে কাদাপানি। পিছনে কপালে ব্যান্ডেজ বাঁধা হামিদ। এসেই হাপুস-হুপুস কান্না। রেডিওতে খেলা শুনতে শুনতে গাড়ি চালাচ্ছিলো হামিদ। গতিবেগ বাড়ছে আর বাড়ছে। মিজমিজি গ্রামের কাছে একটা গাড়িকে ওভারটেক করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িসহ পড়েছে খাদে। স্থানীয় লোকেরা তাদের কাদাপানি থেকে টেনেটুনে বের করেছে। হামিদের কপাল একটু ছড়ে গেছে। বড় ধরনের কোন ইনজুরি হয়নি। শনির আখড়া থেকে ফার্স্ট এইড নিয়ে বেবী ট্যাক্সিতে এসেছে বাসায়। গাড়ি আছে পুলিশ হেফাজতে।

মীরাকে জড়িয়ে ধরে লিসা বললো, "জান মা, ৩১৪ রানের কথা শুনে ওর মাথা ঠিক ছিল না। বিজয়ের আনন্দ নিয়ে ইফতারের পর খাবো বলে কুমিল্লা থেকে তোমাদের জন্য কতো শখ করে ছানামুখী আর রসমালাই নিয়ে এসেছিলাম। সব মিজমিজিতে পানিতে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। বলেই আরও একবার হাপুস-হুপুস করে কাঁদলো।

জ.

ড্রইংরুম থেকে রিয়াদ সাহেব একটা সম্মিলিত চিৎকার শুনলেন। মুঙ্গিয়া মুঙ্গিয়া-মুং গি য়া। নো চার, নো চার। চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে কিচেন থেকে কাজের মেয়েটার প্রাণফাটা মরণ চিৎকার, "আল্লাহ্ গো আল্লা গো ......।" রিয়াদ সাহেব তাড়াহুড়ো করে বিছানা থেকে নামতে গিয়ে কম্বল পেঁচিয়ে হুড়মুড় করে পড়লেন মেঝেতে।

ঝ.

কাজের মেয়েটি ডাল নামাচ্ছিল চুলা থেকে। ড্রইংরুমের সম্মিলিত চিৎকারে সে আৎকে ওঠে। সেই ফাঁকে গরম ডাল পুরোটা পড়েছে তার পায়ে। যাদু আর মনি তাকে নিয়ে তক্ষুণি ছুটলো হাসপাতালে। রিয়াদ সাহেবকে বিছানায় জোর করে শুইয়ে দেয়া হলো। ডাক্তারকে ফোন করে দিলো লিসা।

"রিয়াদ সহেব বললেন, তোমরা এতো ব্যস্ত হচ্ছো কেন? তেমন কিছু হয়নি আমার।"

রিয়াদ সাহেবের ঠোঁট কেটে গেছে। আর পা-টা একটু মচকেছে।

ডাক্তার বললো, “তেমন কিছু হয়নি। শুয়ে থাকুন। কাল দু’একটা পরীক্ষা করাবো।”

ঞ.

রিয়াদ সাহেব শুয়ে রইলেন। একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বোধ হয়।

মা এসে কপালে হাত বুলাতে বুলাতে বললো, “খোকা, শোন। ছক্কা মারা ছোকরাটার সঙ্গে বুলার বিয়ের প্রসঙ্গটা বাদ দে। বুলা বোধ হয় মত পাল্টেছে। বাঁচা গেল। কি বলিস।”

রাতে পাশে শুতে শুতে স্ত্রী বললেন, “কি অলক্ষুণে খেলা গো।”

রিটা আশরাফ

মিলেনিয়াম-২০০০

মাইজপাড়ার ঠিক মাঝখানে করিম মিয়ার একচালা ছনের ঘর। ঘরের ভেতরে বাহিরে দারিদ্যের নগ্ন দেয়াল। বয়সের ভারে করিম মিয়ার ছয় ফিট উচ্চতার শরীর কুঁজো হতে হতে সাড়ে চার ফিটে এসে থেমেছে। গায়ের চামড়া ঝুলে পড়েছে। দারিদ্রের ভারে শরীর হাড্ডিসার। বউ মারা গেছে দুই যুগেরও বেশি সময় আগে। ছয় সন্তানের পাঁচজনই পরপারে। একমাত্র জীবিত ছেলের নুন আনতে পানতা ফুরায় সংসার। সেখানে উগড়ে দেয়া বমির মতোই করিম মিয়ার অবস্থান। চোখের ঝাপসা চাউনি নিয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে এখনো টুকটুক করে গ্রামময় হেঁটে বেড়ায় করিম মিয়া। আর কালের নীরব সাক্ষী হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে চারপাশ। যদিও বাকশক্তি এবং শ্রবণশক্তি এখনো পুরোপুরি রুদ্ধ হয়নি করিম মিয়ার।

দুপুর গড়িয়ে বিকেলও শেষ হওয়ার পথে। ঘরের দাওয়ায় তার আগে থেকেও শকুনের মতো ঘাড় কুঁজো করে বসে আছে করিম মিয়া। ভাত খাওয়ার ডাক পড়েনি এখনো। ক্ষুধা চাগিয়ে চাগিয়ে উঠে তার পেটের ভেতর। অবশেষে লাঠিতে ভর করে হাঁটতে হাঁটতে মিয়াদের পুকুর পাড়ে এসে বসে করিম মিয়া। লাঠিটা খুব যত্ন করে রাখে একপাশে। পৃথিবীতে এখন এই লাঠিটাই একমাত্র আপনজন করিম মিয়ার। পশ্চিম পাড়ের তালগাছের ঝাকড়া মাথার ফাঁক গলিয়ে সূর্যের ক্ষীণ অস্তিত্ব দেখা যায়। তন্ময় হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকে করিম মিয়া। এই তাকানোর বাইরে চারপাশ এখন মৃত করিম মিয়ার কাছে। সু-সজ্জিত এক ভদ্রলোক পাশ থেকে বেশ কয়েকবার করিম মিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে। পারে না। শেষে গায়ে ধাক্কা দিয়ে করিম মিয়ার চেতন ফিরিয়ে আনে নিজের দিকে। ঝাপসা চাউনি মেলে জড়ানো গলায় করিম মিয়া জানতে চায়-

কেডা। চিনলাম না তো।

ভদ্রলোকের নিঃশঙ্কোচিত্ত জবাব, জ্বী। আমাকে চিনবেন না। আমি ঢাকা থেকে এসেছি।

কাঁপা কাঁপা গলায় করিম মিয়া বলে, কার কাছে বাবাজী।

আপনার কাছে।

ভদ্রলোকের দিকে ঝাপসা চাউনি মেলে বিস্ময় জড়িত কণ্ঠে করিম মিয়া আবারও জানতে চায়- আমার কাছে! কি কামে?

জ্বী, অনেক খুঁজে খুঁজে আমি জেনেছি আপনি এলাকার একমাত্র প্রবীণ ব্যক্তি। আপনার বয়স কত হবে এখন বলতে পারেন?

কথা বলতে বলতে ভদ্রলোক বসে পড়ে করিম মিয়ার পাশে।

করিম মিয়া খানিক ভেবে নিয়ে বলে- তা অইব, পাঁচকুড়ি ছয় সাত বছর।

তার মানে আপনি তিন শতাব্দীর পুরুষ! ভদ্রলোকের চোখ চিক্ চিক্ করে উঠে আনন্দে। অবশেষে সে পেল তাহলে। সূর্যের ক্ষীণ অস্তিত্বের দিকে তাকিয়ে বলে,

আপনি কি জানেন চাচা মিয়া, ঐ যে সূর্য ডুবে যাচ্ছে, এটা এই শতাব্দীর শেষ সূর্য। এই সহস্রাব্দের শেষ সূর্য। কাল যে সূর্য অস্ত যাবে সে সূর্য হবে নতুন শতকের, নতুন সহস্রাব্দের।

করিম মিয়া কিছু বুঝতে পারে না। বোকার মতো হা করে তাকিয়ে থাকে ভদ্রলোকের মুখের দিকে। পেটের ভেতর তার ক্ষুধার যন্ত্রণা চিনচিনিয়ে উঠে। ভদ্রলোক অতি বিনীতভাবে বলে- চাচা, আপনি কি কষ্ট করে একবার যাবেন আমার সাথে?

ক-ই যা-মু বাবাজী?

ঢাকায়।

ঢাকায়! ঢাকায় কেন্ যামু?

ঢাকায় মিলেনিয়াম মঞ্চ তৈরী হয়েছে। সেই মঞ্চে নতুন শতাব্দীকে, নতুন সহস্রাব্দকে বরণ করা হবে। দেশের কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবিসহ সকল স্তরের মানুষ বরণ করবে নতুন সহস্রাব্দকে, নতুন শতাব্দীকে। তিন শতাব্দীর একজন পুরুষ হিসাবে আপনিও থাকবেন আমাদের সেই মঞ্চে।

করিম মিয়া বোকার মত জানতে চায়, মাইলেনিম কি?

মিলেনিয়াম মানে সহস্র বছর।

করিম মিয়ার আবার বোকার মত প্রশ্ন-সহস্র কি?

সহস্র মানে এক হাজার। আপনি আমার সাথে চলেন চাচা মিয়া।

করিম মিয়া আপত্তি করে না। জীবনে সে অনেক কিছুই দেখেছে। কিন্তু ঢাকা শহর দেখেনি। ঢাকা শহর দেখার আমন্ত্রণে সে ভুলে যায় ক্ষুধার যন্ত্রণার কথা, শরীরের ভারসাম্যহীনতার কথা।

ভদ্রলোক করিম মিয়াকে গাড়িতে তুলে নিয়ে রওনা হয় ঢাকার পথে। পাগলা ঘোড়ার মত ছুটে চলে গাড়ি। ভদ্রলোক ড্রাইভারকে বলে আরো জোরে, আরো জোরে গাড়ি

চালাও। রাত বারটার আগে ঢাকায় তার পৌঁছানো চাই-ই চাই। শেষ পর্যন্ত বারটা বাজার মিনিট কয়েক আগে যথাস্থানে পৌঁছায় তারা।

করিম মিয়াকে চাঙদোলা করে তুলে নেয়া হয় মঞ্চের উপর। তার এক হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় সাদা কবুতর অন্য হাতে বেলুন গুচ্ছের সুঁতো। করিম মিয়া কিছু বুঝতে পারে না। সামনে হাজার দর্শক শ্রোতা। বিশাল মঞ্চ। চারপাশে আলোর ঝলমলানি। এসব কখনো দেখেনি করিম মিয়া। রাত যখন ঠিক বারটা বেজে এক মিনিট কে যেন পেছন থেকে তার হাত উচুঁ করে সাদা কবুতর উড়িয়ে দেয় আকাশের দিকে। বেলুনগুচ্ছ হাত মুক্ত করে উড়িয়ে দেয় উপরে। মুহূর্তে চারপাশ ফেটে পড়ে ভয়ংকর উল্লাসে। এক সময় মঞ্চে অনেক জ্ঞানী-গুণীদের পাশে বসানো হয় করিম মিয়াকে। মাউথ স্পীকারের সামনে দাঁড়িয়ে একের পর এক বলে যায় গত শতাব্দীতে পৃথিবীতে নিজেদের অবদানের কথা। পৃথিবীর উন্নতির কথা। মানুষ এভারেস্টের আকাশ ছোঁয়া চূড়ায় উঠেছে। চাঁদে গিয়েছে। মঙ্গল গ্রহে গিয়েছে। উদ্‌ঘাটন করছে নতুন নতুন গ্রহ, উপগ্রহ, ব্ল্যাকহোল। সাহিত্য, সাংস্কৃতিতে আজ সফলতার জয় জয়কার।

করিম মিয়া অস্পষ্ট সবকিছু শুনতে পায়। কিন্তু সেখানে করিম মিয়ার মাইঝপাড়া নিয়ে কোন কথা শুনতে পায় না। শুনতে পায়না একশ বছরের ভেতর মাইজপাড়ার কোন উন্নতি অবনতির কথা। মানুষ যেখানে মঙ্গল গ্রহে গিয়েছে সেখানে করিম মিয়ারা এখনো সেই ধান ক্ষেতের আল দিয়েই চলাফেরা করে। যেই আল দিয়ে চলাফেরা করেছে করিম মিয়ার বাবারা, দাদারা। দাদার বাবারা। করিম মিয়ার ক্ষুধা চিনচিনিয়ে উঠে। কয়েকজনের কথা বলার পর করিম মিয়াকে ধরে ধরে নিয়ে দাঁড় করানো হয় ডায়াসের সামনে। চারপাশ থেকে বিশেষ অনুরোধ করা হয় তিন শতাব্দীর এই পুরুষকে কিছু বলার জন্য। সবার চোখ নিবদ্ধ হয় সাড়ে ছয় ফিট উচ্চতার এই থুরথুরে বুড়ার উপর।

করিম মিয়া বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে চারপাশে তাকায়। কিছু বলতে পারে না। হঠাৎ নিজের অজান্তেই দু'ঠোট ফাঁক হয়ে যায় করিম মিয়ার। জড়ানো গলায় শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চীৎকার করে বললো,

ভাত দে হারামীর বাচ্চারা।

মুহাম্মদ লাভলু সরকার

আলোর অন্তিমতা

পারভীন দশম শ্রেণীতে পড়ে, আজ পারভীনের নির্বাচনী পরীক্ষার রেজাল্ট বের হবে। পারভীনের মন আজ খুব খুশি। কল্পিত ডানায় ভর করে সে উড়ে বেড়াচ্ছে স্বপ্নের জগতে। আজ তার বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ হবে এবং আজই কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করা হবে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মির্জাপুর উপজেলার এমপি, উপজেলা চেয়ারম্যান এবং আরো অনেক গন্য-মান্য ব্যক্তিবর্গ। প্রথম শ্রেণী থেকে এ পর্যন্ত পারভীন বরাবরই ক্লাশে প্রথম হয়ে এসেছে এবং এবারও সে যথারীতি প্রথম স্থানই অধিকার করেছে। এ সংবাদটি ইতোমধ্যেই পেয়ে গেছে সে।

পারভীনকে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকা সবাই খুব ভালবাসে। গ্রামের সবাই পারভীনের মাঝে দেখে আশার আলো। মেয়ে হিসেবে পারভীন অতুলনীয়। আজ সে একটু আগেই স্কুলে যাচ্ছে। বাড়ী থেকে বের হয়ে কিছু দূর যাওয়ার পর হঠাৎ সে শুনতে পায়, সামনের কোন একটি বাড়ি থেকে কান্নার শব্দ আসছে। পারভীন আরো সামনে হাঁটে, কান্নার শব্দ এবং মানুষের আনা-গোনা আরো স্পষ্ট হয়। পারভীন আরো একটু এগুতেই দেখে তার বড় চাচা ওয়াজেদ আলী এদিকে আসছে। পারভীন তার চাচার মুখে বিষণ্নতার ছায়া দেখতে পায়। চাচাকে দেখে জানতে চায় ঐ বাড়ীগুলোতে এত হৈ চৈ, কান্নাকাটি কেন?

চাচা জানালেন, মা পারভীন, ঐ মিয়া বাড়ীর জমির অনেকদিন অসুস্থ্য থাকার পর আজ সকাল বেলায় মারা গেছে। আহা খুব ভাল লোক ছিল জমির। অন্যের জমিতে সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে কাজ করলেও কখনো কাজকে ফাঁকি দিতো না। সে অন্যের কাজকে সবসময় নিজের মনে করে কাজ করতো। অথচ আজ জমির চিকিৎসার অভাবে ছটফট করে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিল। ঘরে তার পাঁচটি ফুটফুটে মেয়ে এবং বউ। ওদের চোখের পানি কিছুতেই বাধ মানছে না। একমাত্র জমিরই ছিল তাদের মুখের আহার যোগানদারী।

অত্যন্ত ব্যথা কাতর এবং অপরাধীর স্বরে তিনি বলতে লাগলেন, আমরা গ্রামবাসী কত নিষ্ঠুর, জমির যখন অসুস্থ ছিল, জমিরের বউ ও মেয়েরা সবার দ্বারে দ্বারে কত ঘুরেছে একটু সাহায্যের জন্য। কেউ এগিয়ে আসেনি।

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, তো মা, আমি এখন যাই। তুমি স্কুলে যাও আমি কিছুক্ষণ পর তোমার বাবাকে নিয়ে স্কুলে আসছি। আজ আমাদের উত্তর বাড়ীর মুখ উজ্জ্বল করবে তুমি। এই বলে ওয়াজেদ চাচা চলে গেলেন।

পারভীনের হাসি খুশি মনটা ভেঙ্গে একাকার হয়ে গেলো। সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। পাশে একটি গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল পারভীন। মনে আজ তার হাজার প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। সামান্য কিছু টাকা ও চিকিৎসার কারণে আজ জমির চাচার পরিবারে নেমেছে অন্ধকার। এসব ভাবনায় পারভীনের মন ক্রমেই আরো খারাপ হচ্ছে।

পারভীন সিদ্ধান্ত নিল, "আমি আজ স্কুলে যাবো না"– আবার বাড়ীর দিকে রওনা হলো পারভীন। পথিমধ্যে পাশের বাড়ির পাঁপিয়া খালার সাথে দেখা হয়। খালা জানতে চায়,

পারভীন তুমি স্কুলে গিয়েছিলে?

হ্যাঁ খালা, গিয়েছিলাম।

এসে পড়লে কেন?

খালা আমার মনটা আজ ভীষণ খারাপ।

কি হয়েছে?

খালা তুমি কি জানো , জমির চাচা আজ সকালে মারা গেছেন।

হ্যাঁ শুনেছি। আমারও খুব কষ্ট লেগেছে। চিকিৎসার অভাবে তাকে আজ জীবন দিতে হলো।

খালা, তুমি কি আমাকে একটি প্রশ্নের উত্তর দেবে? তুমি তো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করো। তুমি অনেক কিছু জানো। আমি কি বড় হয়ে ডাক্তার হতে পারবো? আমি ডাক্তার হতে পারলে কাউকে আর বিনা চিকিৎসায় মরতে দেব না।

অবশ্যই তুমি ডাক্তার হতে পারবে। আমি দোয়া করি। তুমি একদিন অনেক বড় ডাক্তার হবে।

একথা বলে পাপিয়া খালা তার গন্তব্যের দিকে পা বাড়ায়। পারভীনও বাড়ী চলে আসে। বাড়ী এসে পারভীন কাউকে দেখতে পায় না। উত্তর বাড়ীর সবাই আজ স্কুলে গিয়েছে স্কুলের কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান দেখার জন্য। পারভীন নানা ভাবনায় নিজেকে ডুবিয়ে দিল। এদিকে স্কুলে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পারভীনের নাম ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথে পারভীনকে খোঁজায় সবাই ব্যস্ত হয়ে পরে। পারভীনের মা-বাবা মেয়েকে খুঁজে না পেয়ে স্কুল থেকে বাড়ী চলে

আসে। এসে দেখে তার মেয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। শরীরে তার হালকা জ্বর। খানিকবাদে পারভীনের চাচা ওয়াজেদ আলী আসে এবং দূর থেকেই মা পারভীন, মা পারভীন বলে চিৎকার করে ডাকে। পারভীনের কাছে গিয়ে বলে, মা পারভীন তুমি এখানে। এই দেখো মা, আমাদের এমপি সাহেব তোমাকে সেরা কৃতিছাত্রীর সনদ এবং নগদ দশ হাজার টাকা পুরস্কার দিয়েছেন। পারভীন খুব খুশি হয়। বিছানা ছেড়ে উঠে বসে। বাবা এবং চাচাকে উদ্দেশ্য করে বলে,

আচ্ছা, আমার পুরস্কারের এই টাকাগুলোতো সব আমার।

বাবা বলেন, নিশ্চয়ই।

পারভীন একটু ভেবে নিয়ে বলে, এই টাকাগুলো যদি আমি জমির চাচার পরিবারকে দিয়ে দেই, তাহলে তোমরা কি রাগ করবে?

ওয়াজেদ আলী তার চোখের পানি ধরে রাখতে পারে না। মেয়েকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে বলেন, যে কাজ আমাদের করার কথা সে কাজ তুই করতে চাস, আর এ কাজে তোকে বাঁধা দেবো, এটা কি করে হয় মা। এই বলে ওয়াজেদ আলী চোখ মুছতে থাকেন। একটু থেমে আবার বলেন, আজ যদি আমাদের সমাজ জমিরের চিকিৎসার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতো, তাহলে জমিরকে বিনা চিকিৎসায় ধুকে ধুকে মরতে হতো না।

পারভীনের এখন একটাই স্বপ্ন। সে বড় হয়ে ডাক্তার হবে, ডাক্তার হয়ে এই গ্রামে সে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করবে। গ্রামের জন্য পারভীনের খুব মায়া। কথাগুলো পারভীন বলছে পাঁপিয়া খালাকে। পাঁপিয়া খালাকে বার বার প্রশ্ন করে পারভীন, আমি কি সত্যিই ডাক্তার হতে পারবো? তোমাদের মতো করে কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারবো? পাঁপিয়া খালা পারভীনকে সব সময় সাহস যোগায়। বলে, আমার বিশ্বাস, তোমার স্বপ্ন অবশ্যই সফল হবে।

আর মাত্র এক সপ্তাহ পরেই পারভীনের এস, এস, সি পরীক্ষা শুরু হবে। মির্জাপুর সদর থানার একটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে পারভীনের সিট পরেছে। পারভীনের গ্রাম থেকে মির্জাপুর সদর প্রায় ২০ কিঃ মিঃ দূরে। তাই পারভীন সেখানে তার ছোট খালার বাড়ীতে থেকে পরীক্ষা দেবে।

কিন্তু পারভীনের মন সেখানে যেতে চায় না। কারণ, প্রায় একমাস পারভীনকে গ্রাম ছেড়ে থাকতে হবে । এটা ভাবতেই পারভীনের বুকের ভেতর কেমন করে। গ্রামের জন্য পারভীনের খুব মায়া।

কাল পারভীনের পরীক্ষা। এখন রাত সাড়ে দশটা। পারভীন বই খুলে বসে আছে। ছোট খালা এসে বললেন, কাল পরীক্ষা, শুয়ে পড়। পরীক্ষার আগের রাতে বেশি

রাত জেগে পড়তে নেই। কিন্তু পারভীনের পড়ায়ও বিশেষ মন নেই, ঘুমও আসছে না। একটাই চিন্তা "ডাক্তার হতে পারবো তো?"

এসব চিন্তা করতে করতে একসময় পারভীন ঘুমিয়ে পড়ে। পরদিন সকালবেলা তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে কিছুক্ষণ পড়ালেখা করে নাস্তা করে পরীক্ষার হলে যায় পারভীন । পরীক্ষা শেষ হয় দুপুর একটায়। পারভীনের পরীক্ষা খুব ভাল হয়। এমনি করে পারভীনের সবগুলো পরীক্ষা শেষ হয়।

পারভীন আজ বিকেলবেলা বাড়ী যাবে। ওর খুব ভাল লাগছে। পারভীনকে নেবার জন্য ওর বাবা এসেছে। ছোটখালার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাবার সাথে রওনা হয় পারভীন। গ্রামে এসে তার হাসিখুশি মনটা মূহূর্তের মধ্যেই ম্লান হয়ে যায়। গতকাল রাতে পাশের বাড়ীর পারুখালা মারা গেছে গর্ভাবস্থায়। তাকে সঠিক সময়ে হাসপাতালে না নেওয়ায় মারা যায় সে। পারভীন বাবাকে প্রশ্ন করে, পারুখালাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার মতো একজন লোকও কি গ্রামে ছিল না? বাবা ওয়াহেদ আলী কোন কথা বলতে পারে না। অপরাধীর মতো মেয়ের কথা হজম করে চলে। পারুখালার স্বামী ঢাকায় রিক্সা চালায়। পারভীন ভাবে, পারুখালা আমাকে কত ভালবাসতো। আর সেই খালা না জানি কত কষ্টে ছট-ফট করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। তাহলে আমরা সমাজে বাস করি কেন?

হঠাৎ একদিন রাতের বেলা ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে ওঠে পারভীন। বলে, না না, আমি আর আমার গ্রামের কাউকে মরতে দেব না। পারভীনের চিৎকার শুনে মা-বাবা দু'জনেই পাশের ঘর থেকে মেয়ের কাছে ছুটে আসে। পারভীনের শরীর জ্বরে পুঁড়ে যাচ্ছে। কোন রকমে রাত্রি পার হয়। সকাল বেলা কিছুটা জ্বর কমে। পারভীনকে দেখার জন্য পাশের বাড়ীর পাঁপিয়া খালা আসে। পাাঁপিয়া খালাকে দেখে পারভীন তাকে জড়িয়ে ধরে একই কথা জানতে চায়,

খালা আমি কি ডাক্তার হতে পারবো? আমি আর কাউকে মরতে দেব না খালা।

পারভীনের কথা শুনে পাঁপিয়া খালা চোখের পানি ধরে রাখতে পারে না। একটি ছোট্ট মেয়ে, সে ডাক্তারের বোঝে কি? পারভীন হয়ত বুঝে ডাক্তার হতে পারলে আর কেউ অন্ততঃ চিকিৎসার অভাবে মরবে না। গ্রামের মানুষের প্রতি পারভীনের কত ভালোবাসা, কত প্রেম। তারপর পারভীনকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, আমি তোমাকে দোয়া করি, তুমি অবশ্যই বড় ডাক্তার হবে একদিন। তোমার মত মেয়ে আজ এই সমাজে খুবই প্রয়োজন, তুমি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠ।

পরেরদিন রাতে আবার সেই একই ঘটনা, পারভীনের চিৎকার, আমি আর কাউকে মরতে দেব না। এভাবে কয়েকদিন চলতে থাকে। পারভীনের জ্বর সারে না। গ্রামের এক ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় পারভীনকে। ডাক্তার দেখে বললো, খুব কঠিন অসুখ নয়, এই ওষুধগুলো খাওয়ান। আশা করি ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু পারভীনের

শরীরের উন্নতি হয় না। দিনের বেলায় জ্বর কম থাকে কিন্তু রাতের বেলা জ্বর সারে না। ওর বাবা মা খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে। পারভীনকে শহরে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবে ওরা। কয়েক জায়গা থেকে এ ব্যাপারে টাকাও ধার করে পারভীনের চাচা। কবে পরীক্ষার ফল প্রকাশ হবে। এ চিন্তায় পারভীন আরো অসুস্থ হয়। ওর এখন একটাই ভাবনা, যদি আমার ফল ভাল না হয় তাহলে আমি ভাল কলেজে ভর্তি হতে পারব না। আর ভাল কলেজে না পড়তে পারলে মেডিকেলে ভর্তি হতে পারব না। এসব নানা রকম চিন্তায় পারভীন আরো অসুস্থ হয়। ক্রমেই পারভীনের অবস্থা ভয়ানক খারাপ হতে থাকে। পারভীন চিৎকার করে মা-বাবাকে ডাকতে পারে না। একা একা খাট থেকে নামতে পারে না। সবাই চিন্তিত হয়ে পরে। হঠাৎ একদিন রক্তবমি শুরু হয় পারভীনের। কান্নায় ভেঙ্গে পরে মার কাছে পারভীন জানতে চায়,

মা, আমার শরীর থেকে সব রক্ত যদি এভাবে ঝড়ে পড়ে যায়, তাহলে আমি বাঁচবো কি করে? মা আমাকে বাঁচাও, বাবা আমাকে বাঁচাও। আমি বাঁচতে চাই, আমি মরব না।

গ্রামের সবাই পারভীনদের বাড়ী এসে ভীড় জমায়। পারভীনকে হাসপাতালে নেয়া হবে। এ জন্য ভ্যান গাড়ী খবর দেওয়া হয়েছে। এদিকে পারভীন শুধু বলছে, মা আমাকে বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও। পারভীনের এই আকুতি-মিনতি গ্রামের সব মানুষের চোখে শুধু অশ্রুই ঝড়াচ্ছে না, গাছপালা, আকাশ, বাতাস, ফুল-ফল, সবার মিনতি আজ পারভীনকে নিয়ে। পারভীন তুমি সুস্থ্য হয়ে উঠ।

পারভীনকে হাসপাতালে নেওয়ার জন্য ভ্যান গাড়ী আসে। ওর মৃত প্রায় শরীরটাকে ভ্যানগাড়িতে তুলে নিয়ে সবাই রওনা হয় হাসপাতালের উদ্দেশ্যে। কিছুদূর যাওয়ার পর পারভীনের অবস্থা আরো খারাপ হয়। পারভীন চিৎকার করে মাকে বলছে, মা আমাকে বাঁচাও। মেয়েকে খুব শক্ত করে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে পারভীনের মা। পারভীনের শরীর ধীরে ধীরে ঢলে পড়ে তার মায়ের কোলে। মা বুঝতে পারছে, তার মেয়ের কিছু একটা হচ্ছে। তিনি মুহূর্তের মধ্যে পাথর হয়ে যান। ভ্যান গাড়ী খুব দ্রুত চলছে। ভ্যান গাড়ীতে পারভীনের পাশে বসে আছে তার বাবা ওয়াহেদ আলী, চাচা ওয়াজেদ আলী। হঠাৎ ভ্যান গাড়ী থেমে যায় পারভীনের মায়ের আকাশ কাঁপানো চিৎকারে। বাবা ওয়াহেদ আলী মেয়ের মুখে হাত দিয়ে বলে, মা তুই কথা বল। তোর কি হয়েছে, কথা বলছিস না কেন? দু'চোখ খোল মা, এই বলে ওয়াজেদ আলী আর কোন কথা বলতে পারে না। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। চাচা ওয়াজেদ আলীও পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কোন কথা বলতে পারে না। মায়ের বুক ফাটানো কান্নায় আকাশ বাতাস, পশু-পাখি, সবাই যেন সুর মেলাচ্ছে। পারভীনকে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনা হয়। গ্রামের সবাই ছুটে আসে। সবার চোখে অশ্রু। উত্তর বাড়ীতে আজ মানুষের ঢল নেমেছে।

পারভীনের নিস্তেজ শরীরটাকে কিছুতেই চোখের আড়াল হতে দেবে না ওর মা। তার বারবার একই কথা, না আমার মেয়ের কিছু হয়নি। আমার মেয়ে বড় হয়ে ডাক্তার হবে। তোমরা আমার মেয়েকে নিতে এসেছো কেন? তোমরা সবাই চলে যাও। কাঁদতে কাঁদতে পারভীনের মা জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। পারভীনকে বরই পাতা দিয়ে গোসল করানো হয়। জোহর নামাযের পর পারভীনকে দাফন করা হবে। এরই মাঝে খবর আসে পারভীনের পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছে। সে জিপিএ-৫ পেয়েছে। গ্রাসবাসী পারভীনের স্বপ্নের কথা মনে করে হাউ-মাউ করে কাঁদছে। পারভীনের স্কুলের সহপাঠী, শিক্ষক-শিক্ষিকা সবাই এসেছে শেষবারের মতো পারভীনকে দেখতে । সবার চোখে পানি। এখনই পারভীনের জানাজার নামাজ শুরু হবে, সব প্রস্তুতি শেষ, হাঁটফতেপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সবাইকে লক্ষ্য করে বলেন,

আজ আমার কিছু কথা আছে, আমরা পারভীনের স্বপ্নকে মরতে দেব না। আমরা পারভীনের স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখবো। এইজন্য আজ আমরা গ্রামবাসী সবাই এই শপথ করবো যে, আমরা আমাদের ঘুমিয়ে থাকা মনুষ্যত্ব বোধকে জাগিয়ে তুলে পারভীনকে বাঁচিয়ে রাখবো। যে বোধ ইতোমধ্যেই পারভীন তার জীবন দিয়ে আমাদের মাঝে জাগিয়ে দিয়ে গেছে।

ইন্দিরা হক

যখন ভুল ভাঙলো

অফিসের কোন কাজে মন বসছে না হাসানের। কেমন যেন উদাস উদাস লাগছে। কোন এক অজানা আশংকায় এয়ারকন্ডিশন কক্ষে বসেও চৈত্রের খরতাপের মতো মনের গহীনে চৌচির হয়ে যাচ্ছে হাসানের। বড় স্যারদের রক্তচক্ষু আর ভাল লাগে না। কম্পিউটারের কাজ বিন্দুমাত্র ভুলের জন্য অনেক বড় ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু কি করা, এক ভয়াবহ হৃদয় দহনে ভিতরটা জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর সবকিছুর প্রতি বিতৃষ্ণা জমে ওঠেছে মনে তার।

বারান্দায় বসে একাকী শুধুই ভাবছে হাসান, একটি ছোট্ট নিরিবিলি সংসার ছিল তার। কিন্তু সংসারে আগুন লাগলো কেন? অতীতের স্মৃতি দৃষ্টির সামনে জীবন্ত হয়ে উঠছে। অদূর গ্রামের মধ্যবিত্ত পারিবারের বি. এ. পাশ করা মেয়ে সুপ্রিয়াকে বিয়ে করে যেন আকাশের চাঁদ পেয়েছিল সে। গায়ের রং ধবধবে ফর্সা না হলেও সুন্দরী বললে ভুল হবে না তাকে।

হাসান নামেই অফিস পাড়ায় পরিচিত সে। বি. এ পাশ হাসান খুব নম্র-ভদ্র-সৎ এবং কর্তব্য পরায়ন। সদা হাসি খুশি স্বভাবের লোক। ফায়ার ব্রিগ্রেডের অবসরপ্রাপ্ত এক কর্মচারীর মেয়ে সুপ্রিয়াকে বিয়ে করে হাতের মুঠায় যেন সমস্ত সুখ পেয়েছিল। বিয়ের এক মাসের মধ্যে মগবাজারের একটি ছোট্ট ফ্ল্যাটে নতুন বউকে নিয়ে উঠেছিল ঢাকায়।

সুপ্রিয়াও ঢাকায় এসে যেন এক নতুন জগৎ আবিস্কার করল। ঢাকায় রাত্রির সোডিয়াম বাতির আলো আঁধারে কেমন দেখায় তা ও জানল। ঢাকা শহরের বিভিন্ন পার্ক, আহসান মঞ্জিল, চিড়িয়াখানা, সংসদ ভবন, যাদুঘর, রাজবাড়ী এসব বউকে ঘুরে দেখিয়েছে হাসান। প্রথম প্রথম বউয়ের বায়না মেটাতে কোন আপত্তি করেনি। কিন্তু একসময় এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে, চাকুরীর সীমাবদ্ধ মাসিক আয় দিয়ে সুপ্রিয়ার মন ভরাতে হিমসিম খেতে হয় তাকে। ধীরে ধীরে সুপ্রিয়া যেন শহরের চাকচিক্যময় ভঙ্গুর জীবনের সাথে পাল্লা দিয়ে চঞ্চল হয়ে উঠলো।

এমনি করে তাদের ঘর আলো করে একদিন জন্ম নেয় ফুটফুটে একটি কন্যা সন্তান। হাসান আদর করে তার নাম রাখে অজান্তা। নাম শুনে সুপ্রিয়া বলে, এ নামের অর্থ কি?

হেসে হাসান উত্তর দেয়, নামের অর্থ যাই হোক আমার মেয়ের নাম অজান্তা হাসান। বলেই মেয়ের গালে চুমো খায়। কি যে আনন্দ। না সে আনন্দ বেশিদিন ধরে

রাখতে পারে নি হাসান। ভেবেছিল ঘরে কোন সন্তান এলে সুপ্রিয়া ঘরমুখী হবে, কিন্তু সুপ্রিয়া আরো উদ্দ্যত হয়ে গেল।

ইতোমধ্যে একটা চাকুরীর ব্যবস্থা করে ফেলে সুপ্রিয়া, এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে। আস্তে আস্তে সংসার, সন্তান থেকে দূরে সরে যেতে থাকে সুপ্রিয়া। প্রতিদিন ৯টা ৫টা অফিস, হাজার মানুষের সাথে তার কথার আদান-প্রদান ঘটে। এটাই সে চেয়েছিল। আজ সে আনন্দে আত্মহারা। চলার পথে আসা-যাওয়ার মাঝে পরিচিত হয় একই অফিসের কর্মকর্তা মারুফ সাহেবের সাথে। এখন সুপ্রিয়া অফিস শেষে রিক্সায় বাড়ী ফেরে না, মারুফ সাহেবের দামী গাড়িতে পাশাপাশি বসে বেড়াতে বের হয়। তখন অভূতপূর্ব শিহরণ জাগে তার মনে, আবার ভয়-ভাবনায় ভিতরটা কেঁপে উঠে। আপনি থেকে তুমি সম্বোধনে নেমে আসে এক সময় ওরা।

মারুফ আরও ফ্রি হওয়ার চেষ্টা করে। তোমরা বাঙ্গালী মেয়েরা শুধু জান সংসার। এ ছাড়াও যে জীবনে এনজয় করার অনেক কিছু আছে তা তোমাদের জানা নেই। আমি অনেক দেশে গিয়েছি। সেখানে মেয়েরা যে কতো স্বাধীনভাবে চলে তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না।

সুপ্রিয়ার আনমনা জবাব, দেখুন এটা বাংলাদেশ। স্বামী-সন্তান-সংসার ছাড়া আমরা কিছুই বুঝি না।

মারুফ হেসে উড়িয়ে দেয়, তারপরও তোমার তারিফ করতে হয়। তুমি সেই সংসারকে এড়িয়ে বাইরে এসেছ, এখন দেখবে জীবনের মানে বদলে গেছে।

মারুফের কথায় সুপ্রিয়া মুগ্ধ হয়। তার প্রতি এক ধরনের ভালবাসার জন্ম নেয়। যাওয়া আসার মাঝে দু'জন ঘনিষ্ঠ হয়ে যায়, ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে। মারুফ কথার মোড় ঘুড়িয়ে বলে, ওসব কথা এখন থাক।

একদিন অনেক রাতে বাড়ি ফেরে সুপ্রিয়া। কলিংবেল বাজতেই দরজা খুলে দেয় হাসান। সুপ্রিয়া হাসানের পাশ কেটে ভেতরে চলে যেতে চাইলে হাসানের ডাকে দাঁড়ায়।

হাসান বলে, দাঁড়াও। ঘড়িতে কয়টা বাজে? রাতে না ফিরলেও পারতে। ভাব, আমি কিছু খবর রাখিনা। সারাদিন যার সাথে ঘুরলে ঐ যে ভদ্রলোক মারুফ, তার কাছে থেকে গেলেই তো পারতে।

সুপ্রিয়া ঃ বাজে বকবে না, তোমার মতো আমি অভদ্র নই, এত রাতে তর্ক করতে আমার ভাল লাগছে না।

হাসান ঃ মুহুর্তে হাসানের মাথায় প্রচন্ড রাগ চেপে বসে। বলে, কি! আমি অভদ্র! বলেই জোরে একটা চড় বসিয়ে দেয় সুপ্রিয়ার গালে। রাগে ফুসে উঠে বলে-

একজনের স্ত্রী হয়ে অন্য পুরুষের সাথে রাত ১১টা পর্যন্ত বাইরে ঘুরাঘুরি করে এসে এখন আমাকে ভদ্রতা শেখাও?

একটু থেমে হাসান আবার বলে চলে – এই এক মাসের মধ্যে সংসার সন্তান কারো কোন খোঁজ তুমি রেখেছো? আমি কেমন আছি, কি খেয়েছি, আমাদের সন্তান কেমন আছে এ সবের কোন খোঁজটা তুমি ঠিকমতো রেখেছো? তুমি আছো তোমার অফিস, মারুফ আর তোমার নিজেকে নিয়ে।

খানিক থেমে হাসান আবার বলে, আমাকে স্বামীর অধিকার থেকে ঠকাচ্ছো, সন্ত ানকে তার মাতৃত্বের স্বাদ থেকে বঞ্চিত করছো। কাল থেকে তুমি আর চাকরী করবে না, এটা আমার শেষ কথা।

সুপ্রিয়া ঃ আমি তোমাকে ছাড়তে পারি। তবু চাকরী নয়।

কথাটা শুনে হাসানের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। উড়িরচরে ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছাসে যেমন সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে মানুষকে নিঃস্ব করে ফেলেছিল, হাসানের বুকের ভেতরও তেমনি লাগছে। হৃদয়ে জলোচ্ছাস বইছে, পায়ের নীচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছে।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে শান্ত স্বরে সুপ্রিয়া বলল, আমি চলে যাচ্ছি। এরপর আর তোমার সাথে সম্পর্ক রাখা যায় না।

হাসান স্ত্রীর দুটি হাত চেঁপে ধরে বলে, তুমি মারাত্মক ভুল করছো সুপ্রিয়া। কুয়াশাচ্ছন্ন একটা রাজ্যে তুমি এখন বাস করছো। আমি জানি এ নেশা কাটতে বেশিদিন লাগবে না তোমার। মারুফরা শুধু তোমাদের প্রতি লোভের দৃষ্টি দিয়ে সর্বস্ব কেড়ে নেয়। সুপ্রিয়াদের সাজানো সংসার তছনছ করে। এর বেশি কিছু করে না ওরা। আমার অনুরোধ রাখ, প্লিজ আমার নিজের জন্য নয়, অজান্তার জন্য তোমাকে বেশি প্রয়োজন।

হাতদুটি প্রচন্ড ঝাঁকুনিতে ছাড়িয়ে নিয়ে হন্ হন্ করে বেরিয়ে যায় সুপ্রিয়া। ঐদিন দুপুরের মধ্যেই অফিসের ঠিকানায় ডির্ভোস লেটার পায় হাসান।

সুপ্রিয়া আজ মুক্ত। সেকথা মারুফকে জানাতে কয়েকবার ফোন করে। কিন্তু ফোন রিসিভ হয় না। বেবীট্রেক্সী নিয়ে পথ চলতে চলতে নতুন করে কত স্বপ্ন বোনে আর মারুফ ও হাসানের মধ্যে পার্থক্য খুঁজে বেড়ায়। হাসানের কি আছে? মারুফের আছে বিত্ত, বৈভব, ঐশ্বর্য্য আর প্রাচুর্য। যা আমি চাই। নিজের মনের সাথে একাকী আলাপনি সুপ্রিয়ার।

গাড়ীর ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে সুপ্রিয়া সরাসরি চলে যায় মারুফের অফিস রুমে। একি সেতো নেই। এই সময় তো এখানেই থাকার কথা। টেবিলের উপর চোখ পড়তেই

দেখে একটা খাম, উপরে বেশ বড় করে লেখা "সুপ্রিয়া"। সুপ্রিয়ার মনের ভেতর কেমন জানি অশনিসংকেত নাড়া দেয়। আস্তে আস্তে খামটি খোলে। তাতে লেখা রয়েছে-

সুপ্রিয়া,

তুমি পত্রের ভাষা কিভাবে নিবে জানিনা, তবুও বলবো, গাড়ি, বাড়ি সব বিক্রি করে দিয়েছি। চাকরীটাও ছেড়ে দিলাম। কারণ, আমার নিজের জীবনের চেয়েও আমি আমার মাকে ভালবাসি। তার পছন্দের মেয়েকে আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি। সেই জন্য নিজের দেশ কলকাতায় চলে গেলাম। তবে একটি কথা না বললেই নয়, তোমাদের মত যে সুপ্রিয়ারা প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য্যের মোহে স্বামী-সন্তান ছেড়ে অন্য পুরুষকে ভালবাসতে পারে, আর যাই হোক তাকে বধূ রুপে গ্রহণ করা যায় না। তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধা হলো না। তুমি আমার আশায় থাকবেনা।

ইতি-
মারুফ

চিঠি পড়ে সুপ্রিয়া ধপাস করে বসে পড়ে চেয়ারে। শীতের কনকনে ঠান্ডাতেও সাড়া শরীরে ঘাম ঝড়াচ্ছে ওর। চোখে অন্ধকার দেখছে সুপ্রিয়া। একি হলো, কি হবে আমার। মারুফ আমার সুন্দর জীবনটা এমন করে দিল কেন? হাজার প্রশ্ন নিজের ভিতর চূর্ণবিচূর্ণ করে তুলছে ওকে। অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা চলে যায় মালিবাগে মামাতো বোন শামসুন্নাহারের বাড়ি। বোনকে জড়িয়ে ধরে সব ঘটনা খুলে বলে সুপ্রিয়া।

নাহার ঃ কি করেছিস! তোর সুখের ঘরে নিজ হাতে আগুন দিলি। ছিঃ সুপ্রিয়া ছিঃ। হাসান ভাইকে আমি একবার দেখেছি, ঐ প্রাণবন্তু মানুষটির মূল্য তোর কাছে নাই থাকল। চার মাসের অজান্তার ভবিষ্যৎ কি হবে ভেবে দেখেছিস, জীবন চলার জন্য অর্থের প্রয়োজন আছে, তাই ব... লে।

সুপ্রিয়া হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে। বলে, চুপ কর নাহার, চুপ ক..র।

নাহার ঃ কেন চুপ করবো, এই সমাজে যতদিন মারুফদের বিচরণ থাকবে, তোদের মত গ্রামের সহজ সরল সুপ্রিয়ারা ততদিন প্রতারিত হবে। যখন ভুল ভাঙবে তখন সব দুয়ার বন্ধ থাকবে।

বারবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে সুপ্রিয়া সামনে তার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের রেখা দেখে। কাঁদতে কাঁদতে গলার শব্দ অস্পষ্ট হয়ে আসছে সুপ্রিয়ার। দু'চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝড়ছে। কান্না জড়ানো গলায় বলে,

নাহার, অজান্তাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। খু-উ-ব।

ফারহানা তাজকিয়া

বাসযাত্রী আশফাক

এক

প্রায় আধ ঘন্টা হয়ে গেল আশফাক বাসটিতে উঠেছে। এখনও বাস ছাড়ার কোন তাড়া নেই। বাসায় যাওয়ার জন্য তার মনটা উড়ু-উড়ু করছে। হেলপার মামাকে কয়েকবার তাগাদা দেয়া হয়েছে এরই মধ্যে। কিন্তু কে শোনে কার কথা। আনমনে আশফাক জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ব্যস্ততা দেখে। হঠাৎ তর্ক-বিতর্ক শুনতে পায়। দেখে, তার বিপরীতে একটি সিটের জন্য এই তর্ক চলছে। দেখতে স্মার্ট ও ভদ্র একটি লোক বলছে,

ভাই সিটটি আমার। হঠাৎ প্রয়োজন পড়ায় সিটের উপর বই রেখে আমি নেমেছিলাম একটু। সিটটি ছেড়ে দিন প্লিজ।

অন্যদিকে সিটে বসা মাস্তানের মতো দেখতে লোকটি বলছে, আরে মিয়া শুনেন, এখানে কোন লোক ছিল না, তাই বসছি। আর এটা কি স্কুল কলেজ নাকি, যে বই দিয়ে সিট দখল করবেন?

বই রাখা লোকটি বললো, ভাই এটা কোন কথা হলো। এখানে আমি-ই বসেছি, হঠাৎ প্রয়োজন পরায় একটু নিচে গেলাম।

মাস্তান লোকটি তার দাবীতে অনড় থেকে বললো, বেশি বকবক কইরেন না। এখান থেইক্যা উঠতে পারুম না।

বইওয়ালা লোকটি আর কিছু না বলে সোজা নেমে গেল, যেন যুক্তির এই যুদ্ধে সে যুক্তির কাছে না হেরে শক্তির কাছে হেরে গেল।

দুই

আশফাক আজ আবার বাসে। বাসটিতে যথেষ্ট ভীড়। তারপরেও লোক উঠছে। লোক উঠার কারণও আছে। হরতাল চলছে দেশ জুড়ে। স্বাভাবিক দিনের তুলনায় গাড়ি কম। আজ আশফাককে রড ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো। বাস ছুটে চলছে ফার্মগেট থেকে মহাখালীর দিকে। বাস কম বিধায় কালো ধোঁয়াও কম। জানালা দিয়ে অনবরত প্রবেশ করা বাতাসের ঘ্রাণ নিতে খুব একটা মন্দ লাগলো না তার, অবশ্য সাথে বালিকণাও চুলে ক্ষণিকের বাসা বানাচ্ছে। খানিক পরে একটি ছেলে সিট থেকে উঠে আশফাককে বলল, ভাইয়া বসেন। আশফাক জানতে চাইলো, তুমি

কি সামনেই নামবে? ছেলেটির বিনয় ভরা উত্তর, না ভাইয়া, আমি উত্তরা যাব। আশফাক বললো, আমিও উত্তরাতে যাব। ঠিক আছে তুমি বস। মাঝে মাঝে এভাবে যাবার অভ্যাস আমার আছে। কিন্তু ছেলেটির অনুরোধের জোয়ারে আশফাক বসল। পূর্বের ঘটনাটি তার আজ আবার মনে পড়ল। আনমনে হেসে উঠলো এই মনে করে যে, কেউ সিট ছাড়ে মানবতা দেখিয়ে, আর কেউ জোরপূর্বক সিটে বসে মানবতা কে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে।

তিন

আশফাক আজ যাচ্ছে গাজীপুরে। উঠেছে উত্তরা থেকে। সিট পেয়েছে। দূরের গন্ত ব্য আরামে যাওয়া যাবে ভেবে স্রষ্টাকে ধন্যবাদও দিল। পরের স্টপেজ থেকে একজন বয়স্ক লোক উঠল বাসে। চুলগুলো তার আধাপাকা। মুখে বয়সের ছাপ, ক্লান্ত দেহ যেন একটু বিশ্রাম পেতে চাচ্ছে। আশফাক উঠে দাঁড়ালো এবং বললো, চাচা বসেন। লোকটি বিনয় দেখিয়ে বললো, না ঠিক আছে বাবা। আশফাক কোন কথা না শুনে তাকে জোরপূর্বক বসিয়ে ছাড়ল। অত:পর লোকটি বললো-এমন ছেলে দেখা যায় না বাবা। আধুনিক যুগে শ্রদ্ধাবোধ হারিয়ে গেছে। বাসে কেউতো সিট ছাড়েই না বরং উচ্চ ফালতু চর্চা করে যায়। নিরুপায় হয়ে শুনি আর ভাবি, এদের মা-বাবা কি শেখায়? এদের স্কুল কি শেখায়? কারোর যেন দায়িত্ব নেই? লোকটি বলতে লাগল-তোমার বংশ পরিচয় অনেক উঁচু নিশ্চয়ই। তুমি দাঁড়িয়ে যাবে এতে তোমার তেমন কষ্ট হবে না, কিন্তু আমার মত বয়স্ক লোকের জন্য এটা অনেক বড় পাওয়া। বুঝেছ বাবা, শরীর এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে-কষ্ট করতে ইচ্ছে হয়না, শুধু সেবা পেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু নীতিহীন সমাজে কে কাকে সেবা করবে? সবাই ব্যস্ত, সবাই স্বার্থপর।

চার

প্রায় ১০ বছর পরের কথা। আশফাক এখন একজন কলেজ শিক্ষক। ক্লাশের পড়ানোর সময় প্রসঙ্গক্রমে সে তার জীবনের এই তিনটি ঘটনা ছাত্রদেরকে শোনাল। ছাত্ররা অতি সাধারণ ঘটনা মনভরে শুনলো। ক্লাশে নিরবতা। আশফাক স্যার বলে যাচ্ছেন-এভাবে নৈতিকতার ঘ্রাণ ছড়িয়ে দিতে হবে তোমাদেরকে। সমাজটা কলুষিত হয়ে গেছে বলে বসে থাকা যাবে না। নিজস্ব সত্তা থেকে ত্যাগের উদাহরণ সৃষ্টি করতে হবে। সেই উদাহরণ ঘুমন্ত বিবেকগুলোতে আলোকিত মশাল হয়ে ছড়িয়ে পড়বে সমাজে, অত:পর দেশে, দেশান্তরে। হয়ত একদিন এভাবে সারাবিশ্বে।

রবিউল আলম ফিরোজ

একটি লাশের সাক্ষাৎকার

আমি খুব স্বপ্ন দেখি। ঘুমে ঘুমে তো বটেই এমনকি জেগে জেগেও। এক রাত্রের স্বপ্নটা আমার কাছে খুব আশ্চর্য মনে হলো। আমি কবর জগতে গিয়েছি এবং একজন লাশের সাক্ষাৎকার নিচ্ছি। অনুমতির প্রত্যাশায় তাকে প্রথমেই বললাম, আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। মানে আপনার একটা সাক্ষাৎকার নিতে চাই।

লাশটি খুশি হয়ে বলল, অবশ্যই নিবেন। কারণ জীবিতকালে আমার খুব ইচ্ছা ছিল সাক্ষাৎকার দেয়ার। কিন্তু কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করেনি কিছু।

প্রথম প্রশ্ন করলাম, দুনিয়াতে আপনার নাম কি ছিল?

প্রশ্ন শুনেই উনি কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মশাই, আগে আপনার নাম পরিচয়টা বলেন।

অল্প হেসে বললাম, সকলেই বলে আমি স্বপ্নবাজ। আপনি আমাকে “স্বপ্নবাজ” বলেই ডাকবেন।

ঠিক আছে, এবার আপনি প্রশ্ন করুন।

আচ্ছা, আপনি কখনো প্রেমে পড়েছিলেন?

আরে মিয়া বলেন কি? প্রেমে পড়ার জন্যই তো আজ আমার এই দশা।

মানে?

মানে, সুচিত্রাকে আমি খুব ভালবাসতাম। দীর্ঘ সময়ের প্রেম। বলা যায় জীবনে প্রেম উন্মেষের সূচনা পর্ব থেকেই। ও যখন অন্য একজনকে বিয়ে করে সংসারী হলো তখন আমি দুঃখটা সইতে না পেরে সুইসাইড করলাম।

তার মানে আপনি স্বাভাবিক ভাবে মারা যান নি?

না। আমি প্রেমের মরা।

সবাই বলে ত্যাগেই আনন্দ। তাই জানতে চাইছি প্রাণত্যাগ করতে আপনার কেমন লেগেছিল?

হ্যাঁ, ত্যাগেই আনন্দ। কিন্তু প্রাণত্যাগে আনন্দ আছে কিনা আমি তা আগে জানতাম না। তবে প্রাণ দিতে গিয়ে বুঝেছি প্রাণত্যাগে কোন আনন্দ নেই। ডার্লিং যখন বিয়ে

করলো তখন আমি প্রথম মৃত্যুর স্বাদ পাই। সুচিত্রা অপেক্ষা প্রাণত্যাগেও আমি অতখানি কষ্ট পাইনি। অবশেষে বুঝেছি প্রেমিকা ত্যাগ আর প্রাণত্যাগের মত কাজে কোন আনন্দ নাই।

তাহলে আপনি এখন খুব কষ্টে আছেন?

দুনিয়াতেও কষ্টে ছিলাম। লোকজন ওর সাথে আমাকে দেখা করতে দিতো না। দেখা করতে গেলে অনেক কষ্ট করতে হতো। প্রেমিকা দেখা না দিলে আপনার কেমন লাগে?

সাক্ষাৎকারটা আপনি দিচ্ছেন। আমি না।

ওহ সরি! শেষের দিকে আমি প্রায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম। তাই রেশটুকু এখনও যায়নি। সরি!

তো পৃথিবীতে আপনি কি হতে চেয়েছিলেন?

হতে চেয়েছিলাম অনেক কিছু। যখন গান শুনতাম তখন গানের শিল্পী। যখন ওয়াজ শুনতাম তখন মাওলানা। যখন কবিতা পাঠ করতাম তখন কবি হতে চাইতাম। এমনিভাবে চিত্র দেখে চিত্রকর কখনো আবার হতে চাইতাম চিত্র পরিচালক।

শেষ পর্যন্ত আপনি কি হয়েছিলেন?

লাশ।

আপনার কি আবার পৃথিবীর আলো-বাতাসে যেতে ইচ্ছে করে?

অবশ্যই করে। আমি গড'কে বলে রেখেছি আর একবার ওখানে পাঠাবার জন্য।

কারণটা কি জানতে পারি?

আমি যেন উপযুক্ত হয়ে ওর সামনে দাঁড়াতে পারি। ওকে যেন জীবনসঙ্গী করতে পারি।

আর কোন আশা নেই?

আছে, আমি যেন সন্ত্রাসী হয়ে জন্ম নিই। সন্ত্রাসীকে বিয়ে করতে রাজি না হলে আমি যেন গুলি করে সুচিত্রার খুলি উড়িয়ে দিতে পারি। সেই সাথে আমিও যেন গুলি খেয়ে মরতে পারি। তাহলে আমরা এক সাথে কবর জগতের বাসিন্দা হবো। আমার খুব আনন্দ হবে।

এবার আমার ফেরার সময় হলো। আপনার কাউকে কিছু বলার আছে?

হ্যাঁ। আমার সুচিত্রাকে গিয়ে বলবেন, "আমি এখনও তাকে ভালবাসি। ও যেন সুখে থাকে"।

মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম

স্বপ্নঘোর

বসন্তের ছোঁয়ায় প্রকৃতির প্রাণচঞ্চল নব পল্লব বিটপী শ্রেণীর মাঝে। বাগানের শত ফুলগুলো ফুটেছে প্রিয়ার মেঘকালো কেশে পরাব বলে। আকাশও মেঘমুক্ত নেই। অন্ধকার দলছুট মেঘগুলো যেন প্রিয়জনের আহ্বানে সাড়া দিতে ছুটে চলছে বিরামহীনভাবে। আর আমার ভাবুক মন কেন যেন তাদের এই দুরন্তপনা দেখে নিজেকে বড় বিমর্ষ করছে।

আমি জানিনা আমার কেন এমন হচ্ছে। কোন এক অদৃশ্য ভাললাগার ও ভালবাসার অনুভূতি সৃষ্টি হচ্ছে। বাতাসের নগ্ন ছোঁয়ায় দেহ-প্রাণ আন্দোলিত করছে মনের পুলকিত বাসনা। এর নাম কি প্রেম, নাকি প্রেমে পরা। ভেবে পাইনা।

এমনি করে সারাটা বিকেল কেটে গেল ছাদে, দূরে দু'চোখ যেদিকে যায় সেদিকে তাকিয়ে থেকে। সন্ধা যখন ঘনিয়ে এল, গোধূলী লগনে সূর্য যখন রক্তিম লাল গোলাপ আকার ধারণ করল আমি ভাবলাম, হয়ত আমার স্বপ্ন সৃষ্টি হবে বলে সে দিবসকে ছুটি দিল নিরব রাত্রির পরশ বুলাতে। বসন্ত পেরিয়ে এখন চৈত্রের আহ্বান তাই প্রকৃতিতে এখন প্রখর রোদের আগমন।

প্রায় প্রতি রাতে বিদ্যুৎ চলে যায়। তাই আমি রাতের আঁধারে আমার প্রিয় বারান্দায় এসে দাঁড়াই, দেখি রাস্তায় অনেক ছোট ছেলেমেয়ে ছোটাছুটি করছে। এটা হল ব্যস্ত শহরের শিশুদের সন্ধ্যায় বিদ্যুৎ চলে গেলে দুরন্তপনা ও অবকাশ যাপন। রাত যখন গভীর থেকে গভীর হতে লাগল কেবল আমি একা নিশাচর প্রাণীর মতো নির্ঘুম থেকে আমার কম্পিউটারের গান শুনছি। এমন করে মনের গভীর থেকে যখন গভীরতম স্থানে চলে গেলাম তখন নিজেকে বড় একা এবং নিঃস্ব সাথীহারা কোন এক বট বৃক্ষের মতো মনে হলো। কেননা বৃক্ষকে কেন্দ্র করে অনেক লোক সমাগম ঘটে অথচ বৃক্ষটি নীরবে একা রয়ে যায়। তাই বারান্দায় চেয়ারে বসে চাঁদের মৃদু মাতাল আলোর পরশ গ্রহণ করছি একান্ত কামনা ভরপুর মনে।

কল্পনায় এক মানবীর ছবি ফুটে উঠে যাকে আমি চিরকাল ধরে চিনি অথচ তার দেখা পাচ্ছি না। সে আমাকে কামনা করে অভিসারের পথে। এমনি করে কল্পনায় এক সময় মনে হলো, সে আমার পাশে বারান্দায় এলো। এলোকেশে গোলাপী রংঙের শাড়ি পরে। আমি ঠিক তার বিপরীত পাশে একান্ত নিমগ্ন চিত্তে আকাশের তারাগুলো গুণে যাচ্ছি বিরামহীন। সে আমার মনোহরণী। তাকে উপেক্ষা করা সে পছন্দ করছেনা। তাই সে বিভিন্নভাবে আমাকে তার দিকে আকর্ষণ করার ব্যর্থ চেষ্টা

করছে। সে বারবার তার শাড়ির আঁচল নিশি রাতের মৃদু বাতাসে উড়াচ্ছে, আর কারণে অকারণে চুড়ির রিনিঝিনি ঝংকার তুলছে। মৃদু বাতাসের ছন্দে যখন সে নিজেই আন্দোলিত হয়ে গুন গুন করে গান গাচ্ছিল ঠিক তখনি আমার নিমগ্ন চিত্ত গভীর ঘোর কেটে উঠল। আর আমার চোখ স্থির হয় বাড়ির সামনে রাস্তার দিকে। দেখি একটা মেয়ে সি এন জি থেকে নামছে। দেখে অবাক হই। একি নারী! নাকি স্বর্গীয় কোন অস্পরী! এত সুন্দর রমণী যে কিনা শত পুষ্পের চেয়েও অধিক পবিত্র ও সুন্দর। এ মেয়ে এত রাতে এখানে! আমি ভয় পেয়ে যাই। নিশ্চয়ই কোন ভূত! সাথে সাথে আবার নিজেকে সোধরাই, ভূত বলে আবার কিছু আছে নাকি?

ঠিক তখনি সে কলিং বেলের সুইচ পিট দিল আর সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বপ্নঘোর কেটে গেল।

মোঃ মঈদুল ইসলাম

একটি বোকা ছেলের গল্প

একদিন একটি ছেলে এক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। যাওয়ার পথে একটা গাছের শিকড়ের সাথে পরে গিয়ে তার পা কেটে গিয়েছে। এমন অবস্থায় তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো, ডাক্তার তাকে দেখে বিভিন্ন ঔষুধ খেতে দিলেন আর একটা মলম দিয়ে বললেন,

তোমার যেখানে কেটে গিয়েছে দিনে তিন বার করে সেখানে মলমটা লাগিয়ে দিবা ।

ছেলেটি সেইভাবে কাজ করতে লাগল। দিনে তিনবার করে মলম লাগিয়ে দিতে লাগলো গাছের সেই জায়গায় যেখানে পরে গিয়ে ওর পা কেটে গিয়েছিল। দিনে তিনবার করে নিয়মিতভাবে সেখানে সে মলম লাগাতে শুরু করল। এমন অবস্থায় এক ভদ্রলোক ঐ ঘটনা দেখে ছেলেটির কাছে জানতে চাইল,

এই ছেলে, গাছের সাথে ওটা কি লাগাচ্ছো তুমি?

লোকটির দিকে না তাকিয়েই মলম লাগাতে লাগাতে ছেলেটি উত্তর দিল, কেন? মলম লাগাচ্ছি।

কি জন্য ওখানে মলম লাগাচ্ছো? লোকটি আবার জানতে চাইলো।

ডাক্তার আমাকে বলেছে তোমার যেখানে কেটে গিয়েছে সেখানে এই মলমটা লাগিয়ে দিবা। তাই আমি মলমটা এখানে লাগিয়ে দিচ্ছি। কারণ এই জায়গাতেই আঘাত লেগে আমার পা কেটে গিয়েছিল।

তখন ঐ ভদ্রলোক বলছে, আরে বোকা ছেলে, ডাক্তার কি তোমাকে ঐটা বলেছে নাকি ডাক্তার বলেছে তোমার শরীরের যে জায়গায় কেটে গিয়েছে সেইখানে মলম লাগাতে। তখন ছেলেটা ঐ ভদ্রলোককে উত্তর দিচ্ছে, আরে আপনি বোঝেন না, ডাক্তার আমাকে এটাই বলেছে। তখন ভদ্রলোক আর কোন কথা না বলে ওখান থেকে চলে গেল। ছেলেটা আবারো গাছে মলম লাগাতে শুরু করল। এমন সময় যে ডাক্তার তাকে ঔষুধ দিয়েছিল সেই ডাক্তার ওখান দিয়ে যাচ্ছিল। এমন কান্ড দেখে ঐ ছেলেকে ডাক্তার সাহেব বলছেন,

আরে বোকা ছেলে, এসব কি করছ? তখন ওই ছেলে ঘুরে তাকিয়ে দেখে যে ডাক্তার ওকে ঔষধ দিয়েছিল সেই ডাক্তার। ছেলেটা ডাক্তারকে দেখে রেগে গিয়ে বলল,

আপনার কোন কথা আমি শুনবনা, কারণ আপনি আমাকে বলেছেন তিনদিন এই মলমটা লাগালেই তোমার ঘা শুকিয়ে যাবে। আর আজ সাত দিন হয়ে গেলো আমার ঘা শুকাচ্ছে না। পা নিয়ে হাঁটতে পারছিনা আমি। আপনার মত ডাক্তারের সঙ্গে আমার কোন কথা নেই। আপনারা ডাক্তার না, আপনারা হলেন ডাক্তার নামের কলঙ্ক।

তখন ডাক্তার সাহেব ঐ ছেলেকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন,

আরে বোকা ছেলে, তোমাকে কি আমি এইটা বলেছিলাম যে, তুমি গাছের সাথে মলম লাগিয়ে দিও। তোমাকে বলেছিলাম যেখানে তোমার কেটে গিয়েছে সেখানে মলম লাগিয়ে দিবা। আর তুমি লাগাচ্ছো গাছের সাথে। এতে কি তোমার ঘা শুকাবে? ঐ গাছের সাথে সাতদিন কেন এক বৎসর ধরে বা তারও অধিক কাল ধরে যদি তুমি মলম লাগাও তাহলেও কি তোমার ঘা শুকাবে?

তখন বোকা ছেলেটা ডাক্তারকে আবারো বলছে, আরে আপনিইতো বললেন যে, তোমার যেখানে কেটে গিয়েছে সেখানে মলম লাগিয়ে দিবা। তাইতো যেখানে আমার কেটে গিয়েছে সেখানে লাগাচ্ছি। ঠিকমতো ঔষধ দিতে পারেন না। রোগ ভালো হচ্ছে না আবার কত রকমের বাহানা শুরু করেছেন। যত্বসব। আপনার মত ডাক্তারদের বন্দুক দিয়ে গুলি করে মারা দরকার।

ছেলেটোর ঐ কথা শুনে ডাক্তার সাহেব রেগে গিয়ে বললেন, তোমাদের মত রোগীকে বা তোমার মত পাগলকেই গুলি করে মারা দরকার। কেননা তোমরা দেশের সম্পদ না, তোমরা হচ্ছো দেশের বোঝা বা দেশের জন্য অভিশাপ। তোমাদের মত পাগলকে দিয়ে জাতি কি পাবে। তোমাদের বলা হবে একটা করবে আরেকটা। আবার শেষে দোষ চাপিয়ে দিবা অন্যের ঘাড়ে। নিজে পাগলের মতো জ্বলে পুড়ে মরবে আবার অন্যজনকেও মারার জন্য পায়তারা শুরু করবে। তোমাদের মতো পাগল ধ্বংস হোক এটাই জাতির কামনা। তোমরা জাতির বোঝা। জাতির কলঙ্ক। তোমাকে বলেছিলাম, তুমি যে জায়গাতে আঘাত পেয়েছো, যেখানে ক্ষত হয়েছে সেখানে মলম লাগাবা আর তুমি লাগাচ্ছো এসে গাছের সাথে। এখানে গাছের কি কোন ক্ষত হয়েছে, কিংবা গাছের কি কোন জায়গায় কেটে গেছে যে তুমি এসে এখানে মলম লাগাচ্ছো?

বোকা ছেলেটা এবার উত্তর দিচ্ছে,

তো এখন এটা খুলে বলতে পারছেন, আর তখন বলতে পারছিলেন না। তখন বললেন, তোমার যেখানে কেটে গেছে সেখানে লাগিয়ে দিবা। তাই এখানে কেটে গেছে এখানে লাগাচ্ছি। আপনি তো আমাকে দেখিয়ে দিতে পারতেন যে, তোমার যেখানে কেটে গেছে সেই জায়গা বের কর আর এই ক্ষত স্থানে দিনে তিনবার করে মলম লাগিয়ে দিবা। নিজের দোষ ঘারে নিতে চান না।

ডাক্তার আর কোন কথা না বলে ছেলেটির পাশ কেটে গন্তব্যের দিকে পা বাড়ালো।